শ্রমিক আন্দোলন, সোহাগ হত্যা ও মজুরি প্রশ্ন

শহীদুল ইসলাম সবুজ

২০০৬ সালের মে মাস থেকে শুরু হয়ে ওই বছরের প্রায় শেষ পর্যন্ত যে আন্দোলন হয়েছিল তা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। সে আন্দোলন হঠাৎ করে বা বাইরের কারো ইন্ধন-উস্কানিতে হয়নি। বলা চলে, মালিক শ্রেণিই ছিল সবচেয়ে বড় ইন্ধনদাতা। গাজীপুর, সাভার, আশুলিয়াসহ সর্বস্তরের গার্মেন্ট শ্রমিকরা ছিল চরম শোষণ-নির্যাতন আর বঞ্চনার শিকার। তখন সর্বনিম্ন মজুরি ছিল মাত্র ৯৩০ টাকা! ছিল না কোন নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র। এমনকি শ্রমিকরা সাপ্তাহিক ছুটিও পেত না বললেই চলে। মালিকদের নিজস্ব আইন আর ছাঁটাই নির্যাতনে প্রতিনিয়ত চাকরির অনিশ্চয়তা ছিল, এখনও আছে। মালিকদের, রাষ্ট্রের, বায়ারদের মুনাফার ভুঁড়ি স্ফীত করতে গার্মেন্টকর্মীরা অমানবিক শ্রম দিচ্ছে। অমানবিক কর্মপরিবেশ আর স্বল্প মজুরি নির্ধারণের কারণে অধিকাংশ শ্রমিক আজও পুষ্টিহীনতার শিকার।

শ্রম আইনের তোয়াক্কা গার্মেন্ট মালিকরা তখনও করতেন না, এখনও করেন না। প্রায় প্রতিটি গার্মেন্ট কারখানার ভেতরে এখনও মালিকদের তৈরি আইন কার্যকর। শ্রমিকদের দাবি উপেক্ষা করে বরাবরই শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে মালিক শ্রেণির স্বার্থে। ২০১৩ সালে শ্রম আইনের সর্বশেষ সংশোধনীতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ধারা অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে পাস করা হয়েছে। ওই সংশোধনীতে শ্রম আইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি ধারা শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে করা হয়। কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ধারাগুলো এখানে উল্লেখ করা গেল না। শ্রমিকদের ওপর অব্যাহত শোষণ-নির্যাতন-বঞ্চনাই শ্রমিকদের বাধ্য করেছিল আন্দোলনে নামতে।

শ্রম আইনের তোয়াক্কা গার্মেন্ট মালিকরা তখনও করতেন না, এখনও করেন না। প্রায় প্রতিটি গার্মেন্ট কারখানার ভেতরে এখনও মালিকদের তৈরি আইন কার্যকর। শ্রমিকদের দাবি উপেক্ষা করে বরাবরই শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে মালিক শ্রেণির স্বার্থে।

সমগ্র শ্রমিক অঞ্চল জুড়ে শ্রমিকরা ছিল বেতন বঞ্চনা, শোষণ-নির্যাতন, অবৈধ ছাঁটাইয়ে চরম অনিশ্চয়তায়। গাজীপুরের মাওনায় অবস্থিত এসকিউ গ্রুপের এফএস সোয়েটারে কাজ করতেন গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য ফোরামের তৎকালীন নেতা শফিউল আলম আজাদ, সোহাগ, লিটন, মনির, নজরুল, জামাল উদ্দিন, জুলহাস, রুবেল, রিপন, উজ্জ্বলসহ অনেকে। ফলে শ্রমিকদের সাথে সংগঠনের ভাল যোগাযোগ হয়। অন্যদিকে জেলা নেতা মিন্টু মিয়া আজাদ- সোহাগের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন ওই কারখানার শ্রমিকদের সাথে। মজুরিবিহীন অতিরিক্ত কাজ, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, নারী শ্রমিকদের সাথে নানা রকম দুর্ব্যবহারের পাশাপাশি কারখানা কর্তৃপক্ষ ১১ মে শ্রমিকদের উৎপাদিত মালের রেট ২০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। ওইদিনই শ্রমিকরা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে মজুরি কমিয়ে দেয়া এবং অন্যান্য সমস্যার কথা জানিয়ে সমাধান দাবি করে। কিন্তু মালিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান না করে উল্টো মারধর করে। শ্রমিকরা প্রতিবাদে কর্মবিরতি শুরু করে। ১৩ মে মালিকপক্ষের হয়ে ডাইরেক্টর মহিদুর রহমান আলোচনায় বসে মৌখিকভাবে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন। শ্রমিকরা আবার কাজে যোগ দেয়। কিন্তু চতুর মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সরলতার সুযোগ নিয়ে একদিকে মৌখিকভাবে দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেয়, অন্যদিকে শ্রমিকদের নামে শ্রীপুর থানায় মিথ্যা মামলা দায়ের করে। ১৮ মে ওই মিথ্যা মামলায় বেশ কয়েকজন শ্রমিককে পুলিশ গ্রেফতার করে। ১৯ মে ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন, ওইদিন শ্রমিকরা গাজীপুর চৌরাস্তায় গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য ফোরামের নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ সমাবেশে এফএস সোয়েটার শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়ার আল্টিমেটাম দেয়।

২০ মে শ্রমিকরা গ্রেফতারকৃতদের থানা থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য মালিকপক্ষের কাছে অনুরোধ জানায়। কিন্তু মালিকরা জানায়, তারা থানায় কোন মামলা করেনি। শ্রমিকরা আবার আলোচনায় বসতে চাইলে কর্তৃপক্ষ তাদের কথায় কর্ণপাত না করে পুলিশ, স্থানীয় ভাড়াটিয়া মাস্তানদের দিয়ে শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের করে দেয়। শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। ডাইরেক্টর মহিদুর রহমান এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার সাবেক বিমানবাহিনী কর্মকর্তা সোয়েব মিয়ার নির্দেশে পুলিশ নির্বিচারে শ্রমিকদের মিছিলের ওপর গুলি চালায়। শহীদ হন অন্দোলনরত শ্রমিকদের নেতা আব্দুলাহ আল মেহেদী সোহাগ। পুলিশের লাঠি, গুলি আর টিয়ারগ্যাসে আহত হয় দেড় শতাধিক শ্রমিক। কর্তৃপক্ষ সোহাগের লাশ গুম করার অপচেষ্টা করে। কিন্তু গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশুসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতি আর শ্রমিকদের ব্যাপক প্রতিরোধে লাশ গুম করতে ব্যর্থ হয়। আন্দোলন আরো চাঙ্গা হয়। গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য ফোরামের ডাকে ২৩ মে সোহাগ হত্যার প্রতিবাদে গার্মেন্ট শিল্পে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়। গাজীপুর, সাভার, আশুলিয়া, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁওসহ সর্বত্র লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট সমর্থন করে রাস্তায় নেমে আসে। সারাদিন চলে ধর্মঘটি শ্রমিকদের ওপর পুলিশ আর ভাড়াটিয়া মাস্তানের তাণ্ডব। বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার করা হয় শতাধিক শ্রমিক ও সংগঠককে।

ধর্মঘট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতিতে যাওয়ার সময় গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে ন্যক্কারজনকভাবে গ্রেফতার করা হয় ধর্মঘট আহ্বানকারী সংগঠন গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশুসহ নেতৃবৃন্দকে। একই দিনে একই সময়ে পুলিশ ও গার্মেন্ট মালিকরা আন্দোলনরত শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দের নামে ৪০টির বেশি মামলা দায়ের করে। আন্দোলনের চাপে দীর্ঘ এক যুগ পর গঠিত হয় মজুরি বোর্ড। তখন শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে ৩০০০ টাকা মজুরির দাবি তোলা হয়। কিন্তু সকল দাবিকে উপেক্ষা করে মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল মাত্র ১৬৩০ টাকা।

আজ পর্যন্ত গার্মেন্ট শ্রমিকদের ওপর শোষণ-নির্যাতনের সেই ধারা অব্যাহত আছে। গার্মেন্ট সেক্টরে কর্মরত প্রায় ৫০ লক্ষ

শ্রমিকের ৮০-৮৫ শতাংশই নারী। এদের অধিকাংশই পেটের তাগিদে, গ্রামের হতদরিদ্র ভূমিহীন পরিবার থেকে বাঁচার তাগিদে শহরে এসে গার্মেন্ট কর্মী হয়েছে। গ্রামে তাদের পরিবার ভূমিহীন দরিদ্র থাকার পেছনেও রয়েছে লুটেরা শাসক-শোষক শ্রেণির রাষ্ট্রব্যবস্থা। সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে লুটেরা পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির নির্মম শোষণ-লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প আজ বিশ্বব্যাপী অন্যতম প্রতিযোগী দেশ। শ্রমিকরাও তাদের দক্ষতায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। অথচ শুরু থেকেই গার্মেন্ট শিল্পের শ্রমিকরা সংগঠিত হবার অধিকার, আইনি অধিকার, প্রতিবাদ সভা-সমাবেশের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। অথচ এই শ্রমিকদের রক্ত-ঘামেই দেশের রফতানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ বৈদিশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

২০১৩ সালে গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় ৫৩০০ টাকা। ওই সময় শ্রমিকরা দাবি করেছিল বেসিক ৮০০০ টাকাসহ সর্বমোট ১২০০০ টাকা। সরকার সেই দাবি উপেক্ষা করে নতুন মজুরি নির্ধারণ করে মূল বেতন ৩০০০ টাকা, সব মিলিয়ে ৫৩০০ টাকা (মূল বেতন ৩০০০ টাকা, বাসাভাড়া ১২০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২৫০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ২০০ টাকা, খাদ্য ভাতা ৬৫০ টাকাসহ সর্বমোট ৫৩০০ টাকা)। প্রয়োজনের তুলনায় এটা যে অপ্রতুল, তা মজুরি কাঠামোতে প্রদত্ত বাড়িভাড়া দেখলেই বোঝা যায়। বাড়িভাড়া ধরা হয়েছিল ১২০০ টাকা। অথচ ১২০০ টাকায় ঢাকা বা দেশের কোন শিল্পাঞ্চলে বাড়ি ভাড়া পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তেমনি চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, টিফিন ভাতা, মূল বেসিক মজুরি–সবই বাস্তবের এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। চিকিৎসা ভাতা ২৫০ টাকা মাত্র! বিভিন্ন টেস্ট ও ওষুধের মূল্য বাদ দিয়েও শুধু একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করলেই লাগে কমপক্ষে ৫০০ টাকা। যাতায়াত ভাতা ২০০ টাকা মাত্র, সর্বনিম্ন ভাড়া ৫ টাকায় যাতায়াত করলেও কেবল একজনের কর্মস্থলে আসা-যাওয়াতেই ২৬ কর্মদিবসে কমপক্ষে ২৬০ টাকা লাগে।

> শ্রমিকরা আবার আলোচনায় বসতে চাইলে কর্তৃপক্ষ তাদের কথায় কর্ণপাত না করে পুলিশ, স্থানীয় ভাড়াটিয়া মাস্তানদের দিয়ে শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের করে দেয়। শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। ডাইরেক্টর মহিদুর রহমান এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার সাবেক বিমানবাহিনী কর্মকর্তা সোয়েব মিয়ার নির্দেশে পুলিশ নির্বিচারে শ্রমিকদের মিছিলের ওপর গুলি চালায়। শহীদ হন অন্দোলনরত শ্রমিকদের নেতা আব্দুলাহ আল মেহেদী সোহাগ।

সার্বিকভাবে পোশাক কারখানায় দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শিল্পের ব্যবসাও এখন যে কোন সময়ের চেয়ে ভাল। যদিও ২০১২ সালে তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডে শতাধিক এবং ঠিক পাঁচ মাসের মাথায় ২০১৩ সালে রানা প্লাজায় দেড় হাজারের বেশি শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হবার পর আশঙ্কা করা হচ্ছিল গার্মেন্ট সেক্টরের ভবিষ্যৎ নিয়ে। একদিকে দেশের রফতানিমুখী পোশাক খাতের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ছে। অন্যদিকে মালিকরা বলছে, মজুরি বাড়ালে তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাবে বাংলাদেশ। অথচ এমন আশঙ্কার সমর্থনে কোন পরিস্থিতি এখন বিদ্যমান নেই। সুদূর ভবিষ্যতেও এমনতরো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার মত কোন শর্তও বিদ্যমান নেই। কারণ অনেকগুলো প্রতিযোগী দেশের উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, এর চেয়ে অনেক বেশি মজুরি দিয়েও দিব্যি তাদের ব্যবসা চলছে।

পোশাক রফতানিতে বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও বাংলাদেশের শ্রমিকরা মজুরি পায় বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন। আইএলওর এখন থেকে তিন বছর আগে, ২০১৫ সালে করা 'বিশ্বব্যাপী গার্মেন্ট পণ্য উৎপাদনকারী দেশসমূহের সর্বনিম্ন মজুরি' শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কায় সর্বনিম্ন মজুরি ৬৬-৮০ ডলার (দক্ষতা ভেদে), ভারতে ৭৮-১৬৫ ডলার (রাজ্য ও দক্ষতার মান ভেদে), পাকিস্তানে ৯৯-১১৯ ডলার, ভিয়েতনামে ১০০-১৪৫ ডলার, কম্বোডিয়ায় ১২৮ ডলার, ইন্দোনেশিয়ায় ৯২-২১৩ ডলার, মালয়েশিয়ায় ২২৫-২৫৩ ডলার, চীনে ১৬৫-২৯৭ ডলার (প্রদেশ ভেদে), তুরস্কে ৫১৭ ডলার, মেক্সিকোতে ১৫১-১৬৩ ডলার আর বাংলাদেশে মাত্র ৬৮ ডলার। এর মধ্যে কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও পাকিস্তান ২০১৬ সালে আবার গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি। সেই লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে মজুরি বোর্ড গঠিত হয়েছে। বরাবরের মতই এবারও মজুরি বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি নেয়া হয়েছে সরকার সমর্থক এক ব্যক্তিকে, যিনি গার্মেন্ট শিল্পের শ্রমিকদের সাথে কোন দিনও সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এবং নিরপেক্ষভাবে শ্রমিকদের দাবির পক্ষে অবস্থান নেয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আশঙ্কার কথা এই যে, এবারও শ্রমিকদের দাবি উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা বেশি।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের পক্ষে দাবি তুলেছে ন্যূনতম মূল মজুরি ১০০০০ টাকাসহ মোট মজুরি ১৬০০০ টাকা নির্ধারণের। জীবনযাত্রার খরচ, শ্রমিকের এবং তার পরিবারের চাহিদা, উৎপাদনের খরচ, উৎপাদনশীলতা, পণ্যের দাম, নিয়োগকারীদের সক্ষমতা, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, মুদ্রাস্ফীতির হার, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ইত্যাদির প্রেক্ষিতে দাবি অত্যন্ত যৌক্তিক বলে মনে করি। আরেকটা কথা খুব স্পষ্ট করেই বলতে চাই, প্রচলিত এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিকের দাবি আদায় করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। অব্যাহত লড়াই-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই দাবি আদায়ের পথ তৈরি করতে হবে।

শহীদুল ইসলাম সবুজ: গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক।
ইমেইল: sabuj.shahidul933@gmail.com